১

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ব্যবহৃত হ্যান্ডআউটসমূহ

হ্যান্ডআউট অধিবেশন–১.১
প্রাণবন্ত পরিবেশ (A Responsive Environment) *

প্রশিক্ষণের একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এমন পরিবেশ যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিনিয়ত আশপাশের লোকের নিকট থেকে তার আচরণের উপর মতামত (feedback) পেতে থাকবে। যিনি অন্যদের সাথে কাজ এবং বসবাস করছেন তিনি তাদের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য এই তথ্য জানা তাঁর পক্ষে অতীব মূল্যবান। আমরা যে সব কাজ করি সেগুলোর মধ্যে কোনটি কার্যকর আর কোনটি অকার্যকর তা জানতে এবং সে মোতাবেক সংশোধন বা পরিবর্তন আনতে এই তথ্য অত্যন্ত সহায়ক।

একজন ব্যবস্থাপকের জন্য পরিবেশের এই ব্যাপারটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। যখন কোন ব্যক্তি তার সম্পর্কে অন্যদের অনুমান (assumption), প্রত্যাশা (expectation), মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী হন, তখন প্রকৃতই তিনি একজন সংস্কৃতমনা ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হন। আর এই অবস্থা নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাকে সংবেদনশীলতা, সচেতনতা ও আচরণগত পরিবর্তনশীলতা শেখায়।

আমরা আসাবধানতাবশতঃ অনেক সময় এমন সব কাজ করে থাকি অথবা কথা বলে থাকি যা আপনজনদের কল্যাণ অথবা অকল্যাণ ডেকে আনে। আমরা জ্ঞাতসারে কারো ক্ষতি করে থাকলে হয় তার থেকে দূরে থাকি, অথবা তাকে দুরে সরিয়ে রাখি। আবার এমনও হতে পারে যে, আমরা ভুলটিকে কৃত্রিম উপায়ে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেই অথবা আমাদের কিছু চাটুকার বন্ধুর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। প্রায়ই দেখা যায়, কতক লোকের সান্নিধ্যে আমরা সহজ এবং কতক লোকের ক্ষেত্রে তা নই, অথচ এর কারণও আমরা জানি না।

যদিও এই শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তবুও আমরা অনেকেই এই সত্যটি জানতে অনীহা প্রকাশ করে থাকি। আমাদের ভাবমূর্তির (Image) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন কিছু শুনতে আমরা আগ্রহী নই। আমরা প্রায়ই নিজেকে এবং অন্যকে বুঝাতে চাই যে, আমরা অন্যের জন্য খুবই কাজের লোক, অথবা অন্যেরা আমাদেরকে বুঝবে এবং গ্রহণ করবে, যদি তারা প্রকৃতই আমাদেরকে জানে। আমরা ধরেই নেই যে, আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে আমরা খুবই করিৎকর্মা। অতএব, নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশেও আমরা খুবই মানানসই। আর এতেই বড় ভুলটি ঘটে যায়, কেননা আমরা আসলেই জানিনা আমাদের প্রকৃত পরিচয় কি, আমাদের পারিপার্শ্বিকতার প্রকৃত তথ্য কি, আমরা কোনটি চিনি অথবা চিনি না।

অন্যেরা আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে তা কি আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে পারি? বোধ হয় পারিনা। আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের সম্বন্ধে অন্যদের ধারণা ও প্রতিক্রিয়া পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে। কোন বিরুদ্ধচারীকে পছন্দ না করলেও আমরা তাকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে পারি না। তাছাড়া অনেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্তও করে না।

আমরা এও জানি প্রথম দিকের ধ্যান–ধারণা পরিবর্তন করা কষ্টকর। আমরা প্রায় সবাই সম্ভবতঃ অজ্ঞাতসারেই আমাদের প্রাথমিক ধ্যান–ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। আমরা যদি সচেতন হতাম তাহলে বুঝতাম আমাদের ধ্যান–ধারণা কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, আর তখন হয়তো আমরা এগুলোর পুনরাবৃত্তি হতে দিতাম না।

এসব ধ্যান–ধারণা ও প্রতিক্রিয়া খুঁজে পেতে হলে এসবের লালনকারীদের নিকট থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সহজ উপায় হলোঃ এসব বিষয়ে অন্যদের প্রতিক্রিয়া লালনকারীদেরকে লিখিতভাবে জানানো। অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এধরনের মতামত (feedback) অত্যাবশ্যক। এটা আমাদেরকে বলে দেবে, কখন আমরা কাংখিত ফল লাভ করবো অথবা লক্ষ্য অর্জনে আমাদের আচরণকে সংশোধন করতে হবে। কিন্তু প্রায়শঃ আমরা এসব লিখিত ইঙ্গিতকে মেনে নেইনা, আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই। তাই, যদি আমরা প্রশিক্ষণে খোলামেলা পরিবেশ চাই; তাহলে আমাদেরকে মৌখিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং তা লিখিত তথ্য সম্বন্ধে আমাদের অনুভবের (Perceptions) সাথে যাচাই করে দেখতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা না–পাওয়া তথ্যকে পেয়ে যাবো, ভুল তথ্যকে সংশোধন করতে পারবো, নিজেদেরকে সঠিকভাবে চিনতে পারবো। সজীব পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস হিসেবে নিজস্ব সিদ্ধান্ত–দল (decision group) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এখানেই খোলাখুলি মতবিনিময় করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

উপরের চিত্রে মত বিনিময়ের ধাঁচগুলো সহজেই লক্ষ্যণীয়। ১ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রচলিত শ্রেণীকক্ষ ও প্রশিক্ষককে। তিনি একতরফাভাবে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তথ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এই পদ্ধতিতে তারা সামন্যই শিখছে। ২ নং চিত্রে একটি আলোচনা–চক্র (Discussion Group) দেখা যাচ্ছে। এতে প্রশিক্ষণার্থীরা পরস্পর মত বিনিময় করছে, এবং একে–অপরের জন্য প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট।

---

* Adapted from Asia Regional Consultant Workshop papers held at Lembang, Indonesia, organised by World Education, 1414 Sixth Avenue, New York, 1980.

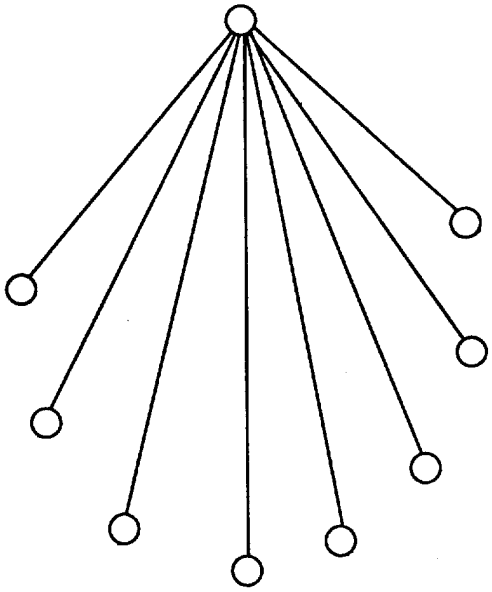

চিত্র নং ১

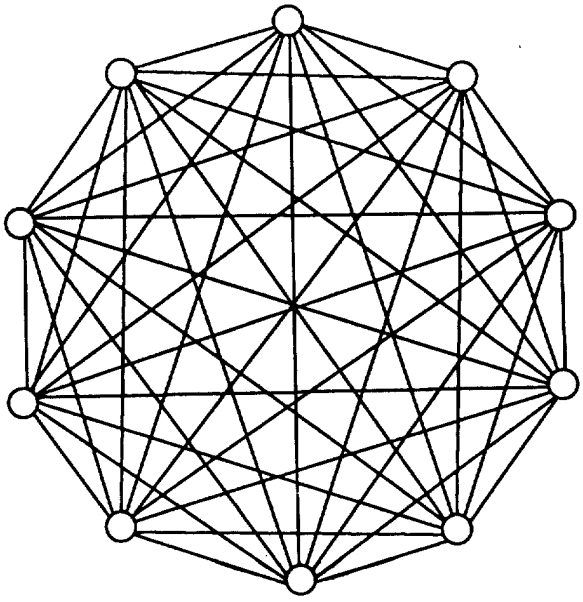

চিত্র নং ২

হ্যান্ডআউট ঃ অধিবেশনঃ ১.৪
একজন উন্নয়ন কর্মীর প্রতিকৃতি (Profile) [১]

উন্নয়ন কর্মী হচ্ছে একজন মাঠ-পর্যায় কর্মী যে জনগণের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা দান করে (যা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে)।

প্রাক-প্রশিক্ষণ প্রতিকৃতি ঃ কতিপয় ধারণা

ধরে নেয়া হয় যে ঃ

- উন্নয়ন কর্মী সমাজাংশের (Community) একজন সদস্য এবং তার আচার-আচরণ এই সমাজাংশের অন্যান্য সদস্যের অনুরূপ
- লিখতে ও পড়তে জানে
- জনগণকে শিখতে সাহায্য করার অভিজ্ঞতা তার আছে

কর্মক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মীর দায়িত্ব

১. জনগণের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ এবং গ্রহণযোগ্য সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সহজতরকরণ
২. সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণে দরিদ্র জনগণকে সহায়তা দান
৩. সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত
৪. সমস্যা সমাধানে যৌথ প্রয়াস প্রয়োগ
৫. উন্নয়নমূলক কার্যাবলী গ্রহণ করার জন্য জনগণকে প্রশিক্ষণ দান
৬. আত্মবিশ্বাস অর্জন ও আত্মসচেতনতা উন্মেষে শিক্ষার্থীকে সহায়তাকরণ
৭. আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম সৃষ্টি ও তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ
৮. উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কার্যকরী পরিবেশ সৃষ্টি করা
৯. গ্রাম/ইউনিয়ন/উপজেলার প্রাপ্য সম্পদকে চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োগ

প্রশিক্ষণোত্তর প্রতিকৃতি

প্রশিক্ষণকালে অর্জিত জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মীর কিছু প্রত্যাশা।

ক. জ্ঞান

১. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানঃ
   * সমাজে ক্ষুদ্রায়তন অর্থনৈতিক উদ্যোগের অবদান
   * দরিদ্র জনগণের অবস্থান ও সমস্যা
   * শোষণের প্রকারভেদ

২. সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞানঃ
   * দারিদ্রের ব্যাপ্তি
   * সামাজিক গঠন বৈশিষ্ট্য-পরিবার, সমাজাংশ, আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো ইত্যাদি

৩. রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞানঃ
   * নেতৃত্ব-আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক
   * স্থানীয় প্রশাসনের কাঠামো, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি

৪. সাংস্কৃতিক বিষয়ে জ্ঞানঃ
   * উৎসব, লোকাচার, রীতি ও প্রথা, ঐতিহ্য, নিয়ম-নীতি

1/ Adapted from- Towards Shared Learnings, by FAO/ BOBP, Madras, India, 1985

৫. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানঃ
   * এই নিয়ন্ত্রণ বিষয়গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক
   * প্রতিষেধক এবং নিরাময় পদ্ধতি
   * স্থানীয় পদ্ধতি

৬. পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞানঃ
   * রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সুবিধাবলী
   * সংরক্ষণ

৭. মহিলাদের ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞানঃ
   * সামাজিক
   * অর্থনৈতিক
   * স্বাস্থ্যগত

৮. এলাকায় অবস্থা উন্নয়নমূলক সংস্থা এবং প্রাপ্তব্য সুবিধাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানঃ
   * সরকারী
   * বেসরকারী

উন্নয়ন কর্মী কতখানি জ্ঞানার্জন করে তার চেয়ে সে কি ভাবে জ্ঞানাহরণ ও তার ব্যাখ্যা এবং উপস্থাপনা করে তার উপরই বেশী গুরুত্ব দেয়া হবে।

খ উন্নয়ন কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি

১. জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিঃ
   * উন্নয়ন কর্মী সবজান্তা নয়। সে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সহজতর করে মাত্র
   * উন্নয়ন কর্মী অন্যের প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং দরিদ্র জনগণের প্রবৃদ্ধির সাথে নিজের প্রবৃদ্ধি ঘটায়
   * শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য উন্নয়ন কর্মী নিরবচ্ছিন্নভাবে অতীতের কাজকে মূল্যায়ন করবে

২. দরিদ্র জনগণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিঃ
   * গরীবদের জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান
   * দরিদ্র জনগণের বিশ্বাস ও কার্যক্রম তাদের কাছে অর্থবহ এবং এগুলোকে জানা প্রয়োজন
   * বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক এবং উপস্থাপনা যথাযথ হলে দরিদ্র জনগণ সকল আলোচনাই বুঝতে সক্ষম
   * জনগণ তাদের সমস্যাবলী সমাধানে সক্ষম

৩. প্রশিক্ষণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিঃ
   * প্রশিক্ষণ হলো এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া
   * প্রশিক্ষণ হলো অভিজ্ঞতার পারস্পরিক বিনিময়
   * প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সমাজ পরিবর্তনের শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে
   * প্রশিক্ষণ অবশ্যই জীবন সম্পৃক্ত হবে
   * শিক্ষার অধিকার ও দায়িত্ব সার্বজনীন
   * জ্ঞান ও দক্ষতাকে মুক্তমনে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করা উচিৎ

৪. উন্নয়ন কাজে যৌথ প্রয়াস বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গিঃ
   * পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণ তাদের প্রাপ্তি ও সাফল্যকে বৃদ্ধি করতে পারে
   * জনজীবনের মানোন্নয়নের একমাত্র পথ সংঘবদ্ধ প্রয়াস
   * প্রতিযোগিতা দলকে বিভক্ত করে
   * শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন দলগত ঐক্য
   * গ্রামের উন্নতি তখনই ঘটে যখন সমগ্র জনজীবনের মান ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌছে
   * জীবনের উপর জনগণের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ লাভই উন্নয়ন
   * উন্নয়ন মানে জনগণের সুপ্ত ক্ষমতার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ

গ. সাংগঠনিক দক্ষতা

১. পরিকল্পনা করার ক্ষমতা
২. দায়িত্ব ভাগ করে নেয়ার ক্ষমতা
৩. সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা

ঘ. কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও নির্বাচনের প্রয়োজন

১. অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন
২. তথ্য শ্রেণীবদ্ধকরণ

ঙ. আলোচনায়

১. প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন
২. ধৈর্য সহকারে শ্রবণ
৩. নিরপেক্ষতা বজায় রাখা
৪. বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা
৫. স্পষ্ট করে বলা
৬. দলের অন্যান্য সদস্যদের আলোচনায় টেনে আনা
৭. নিম্নলিখিত কৌশলের মাধ্যমে কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করাঃ
   - ঘটনা বিশ্লেষণ (Case study)
   - চরিত্র চিত্রণ (Role playing)
   - চিত্রলেখ বা ছবি (Graphs or pictures)
   - অনুভূতিশীল মাধ্যমে জ্ঞান পরীক্ষা (Simulation exercises)

চ. যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা

১. জনগণের নিকট যাওয়া
২. সুষ্ঠু আন্তর্ব্যাক্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা বজায় রাখা
৩. ধারণা উত্থাপন এবং ধারণায় সাড়া দেয়া

ছ. যৌথ পদক্ষেপের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত যোগ্যতা

১. দল গঠন করা
২. দলের সমস্যাবলী চিহ্নিত করা
৩. দলের সমস্যা বিশ্লেষণ করা
৪. দলের জন্য বিকল্প পথের সন্ধান দেয়া
৫. দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা
৬. গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা
৭. বাস্তবায়নের ফলাফলকে বিশ্লেষণ করা।

হ্যান্ডআউট—অধিবেশন ১.৫

পটুয়াখালী জেলার জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ—সামাজিক অবস্থার উপর পর্য্যবেক্ষণ—প্রতিবেদন

এ.এন.এম. জহিরুল ইসলাম
মাহফুজুল বারী চৌধুরী
শিবব্রত নন্দী
শহীদ হোসেন তালুকদার

জুলাই ১৯৮৯ ইং

সূচীপত্র

- ভূমিকা ৫১
- পর্য্যবেক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যাদি ৫১
- আর্থ-সামাজিক অবস্থান ৫১
- মাছ ধরার যন্ত্র ও উপকরণাদি ৫৩
- মাছ বাজারজাতকরণ ৫৪
- একুয়াকালচার ৫৫
- ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার জন্য সুপারিশ ও প্রস্তাবাবলী ৫৬
- উপসংহার ৫৮

পটুয়াখালী জেলার জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উপর পর্য্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

ভূমিকা ঃ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) বি ও বি পি, বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার উপকূলীয় দরিদ্র মৎসজীবি সম্প্রদায়ের আর্থ–সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নকল্পে গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মৎস্য অধিদপ্তরীয় কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সংগঠিত করার জন্য একটি প্রশিক্ষক দল মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকটি গ্রামে যান। তারা সেখানকার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত গরীব মানুষের (স্ত্রী–পুরুষ) সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলেন। প্রশিক্ষক দল সেখানকার সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ–আলোচনা করেন ও মৎস্যজীবিদের আর্থ–সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। তাদের এ সফর–সূচীর সময় ছিল জুলাই ৬–১১, ১৯৮৯ ইং সন। এ পর্য্যবেক্ষণ প্রতিবেদন মূলতঃ তাদের তীক্ষ্ম অনুভূতি ও প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমিত ছিল। এ পর্য্যবেক্ষণ থেকে নূতন তথ্য পাওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রশিক্ষক দল কোন গবেষণালব্ধ মতামতের সঙ্গে তাদের প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এড়িয়ে চলেন কেননা তাতে একে অন্যের মধ্যে মতামতের প্রভাব বিস্তারের কিঞ্চিৎ সুযোগও থেকে যেতে পারে। প্রশিক্ষক দল একটি পূর্ণাঙ্গ অনুভূতি (real impression) ও বাস্তব তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কতকগুলি কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করেন, যেমনঃ

- দলীয় মতামত গ্রহণ
- স্থাণীয় নেতৃবৃন্দ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, সরকারী–বেসরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ভূক্ত লোকজনের ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ এবং
- প্রামাণ্য দলিলপত্র থেকে মতামত সংগ্রহকরণ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচনাকে প্রাসঙ্গিক ও প্রাণবন্ত করার জন্য দলীয় মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়।

সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিশেষ করে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের সথে কাজে অভিজ্ঞতালব্ধ নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে গবেষণা দলটি গঠন করা হয়ঃ

১. এ. এন.এম. জহিরুল ইসলাম
   কন্ট্রোলার, কোডেক্
২. মাহ্‌ফুজুল বারী চৌধুরী
   প্রোগ্রাম অফিসার, কোডেক্
৩. শিবব্রত নন্দী
   মৎস্য বিশেষজ্ঞ, ব্রাক এবং
৪. শহীদ হোসেন তালুকদার
   এডভাইজার ট্রেনিং, কানাডীয়ান রিসোর্স টীম

প্রতিবেদনটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহেই প্রধানতঃ আলোকপাত করবে ঃ

- মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের আর্থ–সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ
- মৎস্যজীবি কর্তৃক ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ
- মৎস্য চাষ এবং মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ
- বাজারজাতকরণ এবং
- ভবিষ্যৎ কর্ম–পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল

২. পর্য্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি

২–১. আর্থ–সামাজিক অবস্থান ঃ

পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার মৎস্যজীবি সম্প্রদায় সমাজে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অত্যন্ত অবহেলিত এবং শোষিত। তারা অত্যন্ত নিম্নমানের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাদের যেমনি রয়েছে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রকট সমস্যা, ঠিক তেমনিভাবে তারা শিক্ষার আলো থেকেও রয়েছে বঞ্চিত। রোগ–শোকে পাচ্ছেনা চিকিৎসা, এমনকি বিশুদ্ধ পানীয় জলেরও রয়েছে অভাব। ঐতিহাসিকভাবেই মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজন এখন মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে। তাদের এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে দারিদ্রের চরম অভিশাপ। যার ফলে এককালের বিত্তবানের ক্রম–অবনতি ভূমিহীনে এবং আস্তে আস্তে নিয়োজিত হয়েছে

মৎস্যজীবি পেশায়। কিন্তু, তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, জেলেদের মত জলধর, বর্ম্মন বা বিশ্বাস উপাধি তাদের কোন সময়ই ছিল না। পটুয়াখালী ও বরগুনায় মৎস্যজীবিদের মধ্যে অধিকাংশই (প্রায় ৮০ শতাংশ) মুসলমান। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান মৎস্যজীবিরক্ষেত্রে মাছ ধরা আয়ের একমাত্র প্রাথমিক উৎস নয়। তারা কৃষি কাজেও নিয়োজিত।

কৃষির তুলনায় মাছ ধরা থেকে আয়ের ধরণ ও প্রকৃতি দ্রুত হওয়াতেই মৎস্যজীবি মুসলমানগণ মাছ ধরায় কারিগরী খাতে অধিকতর বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু আর যাই হোক না কেন খেপুপাড়া ও পটুয়াখালীর উপকূলীয় মুসলমানগণ বংশ পরম্পরায়ই মৎস্যজীবি।

অধিক জনসংখ্যার চাপ এবং ভূমিহীনতার কারণেই মূলতঃ কৃষি খাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে; যার ফলস্বরূপ উপকূল ও নদী তীরবর্তী বসবাসকারী দরিদ্র কৃষককূল মাছ ধরাকেই বিকল্প পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ সমস্ত নব্য মৎস্যজীবিরা দরিদ্রতার কারণেই মাছ ধরায় যান্ত্রিকব্যবস্থায় বিনিয়োগ করতে পারছেনা। ফলস্বরূপ উক্ত পেশায় তাদেরকে দিন মজুর হিসাবে সার্বিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হচ্ছে।

অন্যতর পেশায় কর্মসংস্থান মূলতঃ নির্ভর করে ঐ পেশায় আয়ের সুযোগ ও উত্তরণের উপর। এ সত্যটি হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত "কৈবর্তদাস" নামক মৎসজীবিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কিন্তু হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যে সমস্ত গরীব মৎস্যজীবির জাল-নৌকায় বিনিয়োগের সাধ্য নেই তারাই কেবল তুলনামূলকভাবে ধনী মৎস্যজীবি বা অন্যান্যদের দ্বারা শোষণের শিকার হয়ে থাকেন। অত্যন্ত দরিদ্র মৎস্যজীবিদের সাধারণতঃ দুই ধরনের পছন্দ থেকে থাকেঃ

- অন্য মালিক যাদের জাল নৌকা আছে তাদের সাথে শেয়ারে কাজ করা, অথবা।
- কোন নির্দিষ্ট মৌসুমে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে কাজ করা।

তবে কোন্‌টা গ্রহণীয় তা সাধারণতঃ মালিকদের পছন্দ-অপছন্দের উপরই নির্ভর করে থাকে।

কোন কোন এলাকায় লক্ষ্য করা যায় যে, শেয়ারে মাছ ধরার ক্ষেত্রে মালিক নিজের শেয়ার ব্যতিরেকে জাল ও নৌকার জন্য পৃথক পৃথক শেয়ার নিয়ে থাকে। আবার কোথাও মাছ ধরার খাতে সমুদয় আয় থেকে ৫০% আয় জাল-নৌকার খাতে বাদ দিয়ে বাকীটুকু শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু পটুয়াখালী ও বরগুনা এলাকার দরিদ্র জেলে শ্রমিকদের মজুরী ঐ এলাকায় অন্য যে কোন শ্রমিকের পারিশ্রমিকের চেয়েও তুলনামূলক হারে কম যাহা দৈনিক ২০-৩০ টাকার মধ্যে সীমিত। অধিকন্তু মাছ ধরার স্থল থেকে মাছ বিক্রির বাজার দূরে হলে মজুরী আরও কমতে থাকে; যার ফলে তাদের দারিদ্রের অভিশাপ থেকে কোন ক্রমেই পরিত্রাণ পাওয়ার অবকাশ নাই।

পেশা হিসাবে মাছ ধরাকে সমাজের সর্বস্তরেই নিম্নমানের পেশা মনে করা হয়ে থাকে বিধায় উক্ত পেশাভুক্ত সম্প্রদায়কেও নীচু দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। যার ফলে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের সাথে জেলে সম্প্রদায়ের সচরাচর উঠাবসা মোটেই হয় না। জেলে সম্প্রদায়কে তাই গ্রামের প্রত্যন্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন প্রান্তে বসবাস করতে দেখা যায়।

এমনকি এ শ্রেণীভুক্ত লোকেরা সরকারী সুযোগসুবিধা থেকেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় একেবারেই বঞ্চিত। তাদের বাড়ী থেকে বেরোবার কোন রাস্তাঘাট নেই, নাই কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা কিংবা লেখাপড়ার জন্য কোন স্কুল। ফলে ডায়রিয়া, আমাশয় ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে তাদের নিত্য সঙ্গী।

এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রতাপপুর গ্রামের পানীয় জলের নলকূপটি যেখানে অবস্থিত সেখান থেকে জেলে সম্প্রদায়ের বসতি প্রায় অর্ধ কিলোমিটার। এতেকরে খুব স্বল্প সংখ্যক জেলে পরিবারই ঐ নলকূপ থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতে পারে।

জেলেদের আবাসিক সমস্যাও অত্যন্ত প্রকট। শতকরা ৯০ ভাগ জেলেদেরকেই অস্বাস্থ্যকর গৃহে বসবাস করতে হয়। ফলে যক্ষা ও অন্যান্য রোগে তাদেরকে প্রতি-নিয়তই ভুগতে হয়। জেলেদের মধ্যে শিক্ষার হারও অত্যন্ত কম। দেশের শতকরা ২২ ভাগ শিক্ষিতের মধ্যে জেলেদের শিক্ষার হার ৩-৫% হয়-কিনা সন্দেহ। ফলে অসচেতন জেলেকূলের মধ্যে জীবন সম্পর্কে ধারণাও অত্যন্ত নিম্নমানের।

জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সরকারী সম্প্রসারণ সেবা মোটেই পৌছে-নি। এই সেবা কেবল মাছচাষীর মধ্যেই সীমিত রয়েছে। যারা মুক্ত জলাশয়ে মাছ ধরেন তাদের মধ্যেও এই সেবা পৌছায়নি। ফলে সরকারী মৎস্যনীতির মৌলিক দিকগুলিও তাদের কাছে অজ্ঞাত। আর তাদের এই অজ্ঞতার কারণে তারা প্রভাবশালীদের শিকার হয়ে থাকেন।

জেলে সমাজে নারীদের স্থান অত্যন্ত নিম্নস্তরে। মেয়েরা সাধারণতঃ কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত না থাকায়–পারিবারিক কাজে বিনিয়োগকৃত তাদের শ্রমকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করা হয় না। জেলে সমাজেও মেয়েরা পুরুষের দ্বারা বিভিন্নভাবে শোষণের শিকার হয়ে থাকেন। জেলে সমাজে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, পণ প্রথা, তালাক ইত্যাদি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিছু কিছু হিন্দু জেলে পরিবারে মেয়েদেরকে জাল বুনন কাজে নিয়োজিত দেখা গেলেও মুসলমান জেলে পরিবারের মেয়েরা নিতান্তই গৃহস্থালী কাজের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ। জেলে সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার মোটামুটি শূণ্যের কোঠায়। অবশ্য মুসলিম জেলে বালিকারা ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

তাদের দারিদ্রের প্রধানতম কারণগুলির মধ্যে নিম্নের উদাহরণগুলির উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

১. জেলেদের মধ্যে সচেতনতা ও সংগঠনের অভাব
২. উন্নয়ন প্রচেষ্টার অভাব, বিশেষকরে উপকূলীয় জেলেদের ক্ষেত্রে সরকারী কিংবা বেসরকারী সংগঠন কর্তৃক কোন কর্মসূচী গৃহীত না হওয়া
৩. জেলেদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধা না থাকায় মাছ ধরার জাল, নৌকা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য স্থানীয় মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চড়াসুদে ধার নিতে হয় (এই ধার নেওয়া বর্তমানে একটি প্রচলিত রেওয়াজে পরিণত হয়েছে)
৪. মাছ বিক্রয় ক্ষেত্রে ক্রেতা–বিক্রেতার মধ্যে ৩য় ব্যক্তির যোগসূত্র থাকায় জেলেরা প্রকৃত বিক্রয়ের মূল্যের চেয়ে কম মূল্য পেয়ে থাকে। মাছ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক কোন উপযোগিতা সৃষ্টি না করায় এধরনের দালালীর সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে দরিদ্র জেলেরা মাছ বিক্রয় করেও প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়
৫. পোনা মাছ ধরার জন্য মাছের সংখ্যা একদিকে যেমন প্রকৃতই কমে যাচ্ছে ঠিক তেমনি বেশী সংখ্যক জেলে দ্বারা বেশী মাছ ধরার জন্যও মাথাপিছু ধৃত মাছের সংখ্যা প্রতিনিয়তই কমছে
৬. দ্রুত যানবাহন ও মাছ ধরার স্থলে বরফ না পাওয়ার কারণে জেলেদেরকে মাছ জায়গাতেই কম মূল্যে বিক্রি করতে হয়।

২–২. মাছ ধরার যন্ত্র ও উপকরণাদি

অধিকাংশ জেলেই মাছ ধরার জন্য সনাতনী যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করে আসছে। যান্ত্রিক নৌকার অভাব এবং নৌকার আকার ছোট হওয়ার কারণে গভীর সাগরে মাছ ধরার সুযোগ খুবই কম। উপকূলীয় এলাকায় মুষ্টিমেয় ধনীক শ্রেণীর কাছে যান্ত্রিক নৌকা থাকায় গভীর সাগরে মাছ ধরার ক্ষেত্রে গরীব জেলেদেরকে শ্রমিক হিসাবেই নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

পটুয়াখালী বরগুনা এলাকায় উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ৫০ শতাংশের অধিক নৌকাই সাধারণতঃ খুলনা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল এলাকা থেকে আসে। এ সমস্ত নৌকার মালিক আবার জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। অপরদিকে শতকরা ৯০ ভাগ জেলেই যাদের কোন যান্ত্রিক কিংবা বড় আকারের নৌকা নাই তারা সাধারণতঃ নদী–নালা ও খাল–বিলেই মাছ ধরে থাকে।

মাছ ধরার নৌকা সাধারণতঃ দুই–তিন প্রকারের হয়ে থাকেঃ

- ইলিশ মাছ ধরার জন্য 'জালিয়া নৌকা'
- চিংড়ি কিংবা গুড়ামাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত নৌকাকে "বাঁধা নৌকা" বলা হয়ে থাকে এবং
- সাগরে মাছ ধরার জন্য যে নৌকা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাকে বলা হয় "বাহুরী নৌকা"

জেলেরা মাছ ধরার জন্য সাধারণতঃ যে জাল ব্যবহার করে থাকে সেগুলি হচ্ছেঃ

- ইলিশ মাছ ধরার জন্য "সাইন জাল"
- চিংড়ি ধরার জন্য "বিন্দি জাল"
- এবং সারা উপকূলীয় এলাকা জুড়েই চিংড়ির পোনা ধরার ক্ষেত্রে "মশারি জাল" ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এ সমস্ত জালগুলি অত্যন্ত চিরাচরিত পদ্ধতির এবং আকার খুবই ছোট হওয়ায় স্বল্প সংখ্যক মাছ ধরা পড়ে। এ জালগুলিরও উন্নয়ন সাধন সম্ভব। কিন্তু বিনিয়োগের অভাবে দরিদ্র জেলেরা এগুলির উন্নয়ন সাধন করতে পারছেনা বিধায় মাছ ধরার জন্য তাদেরকে ছোট জালগুলিই ব্যবহার করতে হচ্ছে

*মাছ ধরার মৌসুম এবং স্থান

১. ইলিশ (INDIAN SHAD) : এপ্রিল–আগষ্ট এই সময়ের মধ্যেই সাধারণতঃ ইলিশ মাছ বেশী পরিমাণে ধরা পড়ে। ইলিশ মাছ প্রধানতঃ সাগরে এবং গলাচিপা, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী এবং অন্যান্য এলাকায় নদীতে ধরা পড়ে।

২. বাগদা (TIGER PRAWN) : এর মৌসুম হচ্ছে জুন থেকে আগষ্ট মাস। খেপুপাড়া ও গলাচিপা উপজেলাস্থ নদী–সমূহ এবং মোহনায় পাওয়া যায়।

৩. হরিনা চিংড়ি (BROWN SHRIMP) : এরও প্রাপ্তিস্থান হচ্ছে খেপুপাড়া ও গলাচিপা এলাকায় কাল জল। এর মৌসুম হচ্ছে এপ্রিল থেকে আগষ্ট মাস।

৪. কাঠালিয়া চিংড়ি (LONG- LEGGED SHRIMP) : প্রাপ্তিস্থান হচ্ছে পটুয়াখালী ও বরগুনা এলাকার সকল নদী, নালা, খাল–বিল ও ধানের মাঠ। মে থেকে আগষ্ট মাস হচ্ছে এর মৌসুম।

৫. চালি চিংড়ি (YELLOW- WHITE SHRIMP) ও চাকা চিংড়ি (WHITE SHRIMP) : জানুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাস হচ্ছে এর মৌসুম। এই জাতীয় চিংড়ি প্রধানতঃ সমুদ্রে পাওয়া যায়।

৬. গলদা চিংড়ি (FRESHWATER GIANT PRAWN) : প্রধানত আমতলি, গলাচিপা ও খেপুপাড়া এলাকায় এই জাতীয় চিংড়ি পাওয়া যায়। এ ছাড়া পটুয়াখালী এলাকায় কিছু কিছু নদীতেও তা পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস হচ্ছে এর মৌসুম।

২–৩. মাছ বাজারজাতকরণ

মাছ বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ প্রক্রিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। যার ফলে মাছ বিক্রি করেও জেলেরা খুব কম আয় করতে পারছে।

মাছ ধৃতকারী জেলে থেকে ভোক্তা এবং রফতানিকারক পর্যন্ত মধ্যবর্তী স্থানে এসব দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগী একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মধ্যস্বত্বভোগীদের এহেন ভূমিকাকে নীচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারেঃ

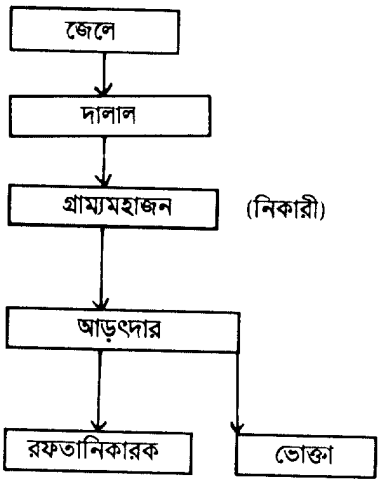

জেলেরা মাছ ধরার যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য আড়তদারদের কাছ থেকে দাদনের মাধ্যমে অগ্রীম টাকা নিয়ে থাকে। এই অগ্রীম গ্রহণের জন্য তাদেরকে বাহ্যতঃ কোন সুদ দিতে হয় না। এই টাকা গ্রহণকে দাদন বলা হয়। বস্তুতঃপক্ষে বড় বড় আড়তদারগণ দালাল এবং গ্রাম্য মহাজনের মাধ্যমে এই দাদনের জাল (Dadon net work) বিস্তৃত করে থাকে।

---

* BFDC (1987) An Export Potential for Frozen Foods & Fishery Products By M. M. Hussain.

প্রয়োজনানুযায়ী দাদনের টাকা পাওয়ার জন্য জেলেরা সচরাচর দালালদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। ফলে জেলেরা ভিন্ন ভিন্ন দালালের দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে (Dalal based clustered group). দাদনের টাকার জন্য জেলেদেরকে কোন সুদ দিতে হয় না সত্যি, কিন্তু তারা নিজ নিজ দালালদের কাছেই মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এই দাদন নেট-ওয়ার্কের মাধ্যমেই দালালরা জেলেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের নির্ধারিত মূল্যে জেলেদের মাছ কিনে নেয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চট্টগ্রামের মাছ রফতানিকারকগণ একমাত্র পটুয়াখালীর আড়তদারদের মাধ্যমেই ৮ কোটি টাকা দাদন দিয়ে থাকে।

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো (এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো) কর্তৃক যদিও প্রকার ভেদে (as per grade) মাছের মূল্য নির্ধারিত রয়েছে-তবুও একমাত্র দাদনের কারণেই দালালদের দ্বারা গোপনে মাছের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া এমন পর্যায়েই দাঁড়ায় যে সেখানে গ্রাম্য মহাজন ও দালালদের ভাগ্যেই লভ্যাংশ পড়ে ৩০%। আড়তদারদের ভাগে আরও ২৬-৩০% লাভ থাকে। এটাতো গেল কেবল মূল্য নির্ধারণ করার খাতে লাভ। মাছের প্রকারভেদ করতে গিয়ে (grading) এবং ওজনের দিক থেকে অন্যরকম লাভ করে নেয় এ সব দালাল ও আড়তদারগণ। জেলেদেরকে প্রতি ১২০০ গ্রামে ১ কেজি মাছ ধরেই দালালদের কাছে বিক্রি করতে হয়। এবং দালালরা আড়তে প্রতি ১১০০ গ্রামে ১ কেজি হিসাবে বিক্রি করে আসছে। এই ব্যবস্থা মাছ বিক্রির ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা চিরাচরিত ধারা হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ হিসাবে দেখানো হয় গুনগত মানের কারণে রফতানিকারকগণ মাছের রকম বা প্রকার স্থির করতে গিয়ে (for grading purpose) কিছু মাছ বাদ দিয়ে থাকেন। সুতরাং আগে থেকেই ক্রয়কালীন সময়ে সেটা পুষিয়ে নেওয়া হয়।

মাছ বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়ায় এই সমস্ত দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাবের কারণেই জেলেরা এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো কর্তৃক মাছের নির্ধারিত-মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অপর পক্ষে এ মূল্যের শতকরা ৬০ ভাগই এ সমস্ত দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটস্থ হচ্ছে। তা ছাড়া দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধা না থাকায় এবং মাছ ধরার জায়গায় বরফ না পাওয়ার কারণেও জেলেরা তাদের ধৃত মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে কম দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় ছোটখাট জেলেরা যারা সাগরে মাছ ধরে থাকে তারাও সুবিধাজনক ব্যবসা হবে না বলে ধৃত মাছ ব্যবসাকেন্দ্রে বিক্রি না করে ধৃত স্থানেই বিক্রি করে থাকে।

একদিকে মাছ ধরার হার যতই হ্রাস পাচ্ছে অন্যদিকে মাছের যথাযথ দাম না পাওয়াতে দরিদ্র জেলেদের আয় ততই কমে যাচ্ছে। তথ্যটি প্রায় সকল জেলেরাই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।

রফতানির উদ্দেশ্যে পটুয়াখালীর আড়তে বৎসরে প্রায় ৫০,০০০ মন বিভিন্ন ধরণের চিংড়ি উঠে থাকে। একমাত্র পটুয়াখালী জেলা থেকেই সাংবৎসরে ১,২৫,০০০ মন ইলিশ মাছ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ হয়ে থাকে। পটুয়াখালী শহরে ১৫ টি আড়ত এবং সারা জেলায় মোট ১৬টি বরফ তৈরির কারখানা রয়েছে। এ বৎসর (১৯৮৯) থেকে বেক্সিমকো নামে একটি প্রতিষ্ঠান পটুয়াখালীতে মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু করেছে। বেক্সিমকোর কারখানায় দৈনিক ৫.৫ টন মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ হয়ে থাকে। বরফের কারখানাগুলিতে ৬০-১০০ কেজি ওজনের বড় বড় বরফ-টুকরা উৎপাদন করা হয়। এগুলিতে ৪০ কেজি ওজনের নীচে টুকরা বরফ তৈরি হচ্ছে না বিধায় ছোট জেলেরা যাদের সাধারণতঃ এ পরিমাপের বরফ বেশী দরকার তারা তাদের চাহিদা মাফিক বরফ পাচ্ছে না। এ বাস্তবতার কারণেও ছোট জেলেরা তাদের ধৃত মাছ স্থানীয় নিকারীদের (মধ্যস্বত্বভোগী) কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

খেপুপাড়া ও গলাচিপায় যখন মাত্রাতিরিক্ত ইলিশ ধরা পড়ে এবং সে অনুপাতে যখন বরফ পাওয়া যায় না তখন মাছকে লবণাক্ত করা হয়। মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র এ ইলিশ মাছ বিক্রি করা হয়। শীত মৌসুমে কোন কোন উপকূলের জেলেরা সমুদ্রে-ধরা চিংড়িকে শুকিয়ে "চালী" তৈরী করে চট্টগ্রামে বিক্রি করে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাছ লবণাক্তকরণ ও শুকানো প্রক্রিয়ায় মেয়েরা জড়িত থাকে না।

২-৪.মাৎস্য চাষ (Aquaculture)

পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় মাৎস্য চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পটুয়াখালীতে প্রায় ৫৬,৭০০টি পুকুরে ৪৩০০ হেক্টর জলাভূমি বিদ্যমান এবং বরগুনা জেলায়ও ২৩০০ হেক্টর জলায় প্রায় ৩০,৮০০ টি পুকুর রয়েছে।

এ সকল পুকুরের মধ্যে খুব স্বল্প সংখ্যক পুকুরই (আনুমানিক ১০%) কোন না কোন ভাবে মাছচাষের আওতায় এসেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ সেবা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ অঞ্চলে চিংড়ি বা কার্প জাতীয় মাছ চাষের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী থাকলেও এর উন্নতি সাধনে সরকারী মৎস্য অধিদপ্তর বা স্থানীয়ভাবে সরকারী কর্মকর্তাদের তৎপরতা খুবই কম।

হ্যাচারী বা পোনা মাছ উৎপাদন কেন্দ্রও অপ্রতুল। মাছ চাষের উপর প্রশিক্ষণ কিংবা মাছ চাষে ঋণ দান কর্মসূচী এ অঞ্চলে নাই বললেই চলে।

সরকারী খাস পুকুরের মালিকানার প্রশ্নে এ অঞ্চলে অনেক জটিলতা রয়েছে। এর বাস্তব সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অনেক পুকুরই মাছ চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে না।

পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার উপকূলীয় ও অন্যান্য এলাকার আধা-লবণাক্ত ও স্বাদু পানিতে চিংড়ি চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ এলাকায় সরকারী খাস জমি ও পুকুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির মধ্যে বন্টণ করে ঋণদান ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে মাছ চাষ প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। ভূমি কর ও রাজস্ব আদায় বিভাগ কর্তৃক অ-মৎস্যজীবির মধ্যে জলমহাল লীজ প্রদান বন্ধ করার প্রস্তাব রাখা যেতে পারে এবং এ সমস্ত সরকারী জলমহাল নূতন মৎস্যনীতির অধীনে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করার প্রস্তাবও রাখা যেতে পারে।

৩. ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনার জন্য সুপারিশ ও প্রস্তাবাবলী

কৌশলাদিঃ

দলটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে মৎস্য অধিদপ্তরের বর্তমান কাঠামোগত ও কর্মী স্বল্পতার কারণে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের পাহাড় সমান সমস্যা সমাধান তাদের একার দ্বারা সম্ভবপর হবে না। এর জন্য দু'টি কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারেঃ

১. মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করে তাদেরকে কাজে লাগানো।
২. বেসরকারী সংস্থা-যাদের উপকূলীয় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নয়ন কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদেরকে নিয়োজিত করে চাহিদা অনুযায়ী কর্মসূচী প্রণয়ণ ও জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা।
৩. এতদসঙ্গে অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন কিছু কর্মসূচীর প্রস্তাব রাখা হল ঃ

ক. দল গঠনের মাধ্যমে জেলেদের সমাবেশ ও সাংগঠনিক রূপদানঃ(Mobilisation & organisation of fishermen through group formation): প্রাথমিকভাবে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের লক্ষিত পুরুষ ও মহিলাদের মধ্য থেকে ২৫-৩০ জনকে নিয়ে পৃথক পৃথক দল গঠন করা যেতে পারে।

লক্ষিত মৎস্যজীবি'র সংজ্ঞা নিরূপণ করে বাছাই পর্ব সমাধান করতে হবে। প্রতি গ্রামে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা দল গঠন করতে হবে। এই পুরুষ ও মহিলা দলের মধ্যে সভাসমিতির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভাবের আদান-প্রদান সৃষ্টি করতে হবে। পুরুষ ও মহিলা দলের সদস্য সদস্যাদেরকে এভাবে সচেতন করতে হবে যেন তারা নিজেদেরকে নিয়ে সংগঠন তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে।

সমাবেশ প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নেয়া যেতে পারেঃ

- লক্ষিত জনগোষ্ঠী বাছাই পর্ব
- পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও সম্পর্ক উন্নয়ন
- ব্যক্তিগত ও দলীয় যোগাযোগ
- মনোযোগ সৃষ্টির জন্য আলোচনা ও সভা
- সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদেরকে নিয়ে দল গঠন
- দলীয় কাঠামো ও অর্থনৈতিক নিয়ম-শৃংখলা নিরূপণঃ (দলীয় সভা, সঞ্চয়, আমানত, আদায় ইত্যাদি)
- দলীয় নেতৃত্বের উন্নয়ন

খ. পুরুষ-মহিলাদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষা কার্য্যক্রম (Consciousness raising and educational activities for male female):

এ-কর্মসূচীর আওতায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারেঃ

- উন্নয়নমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা
- সদস্য-সদস্যাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া
- আইনগত সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা চালু করা
- সাপ্তাহিক সভা

- নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর দলীয় কর্মশালা
- আন্তঃদলীয় যোগাযোগ ও দলীয় সংহতি উন্নয়ন
- দক্ষতা বৃদ্ধি

গ. পুঁজি গঠনের জন্য সাপ্তাহিক সঞ্চয়

দলীয় পুঁজি গঠনের নিমিত্তে এবং আর্থিক নিয়ম-শৃংখলার জন্য সদস্যদের মধ্যে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা দেয়ার প্রথা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট দলীয় তহবিল কেবল নিম্নোক্ত খাতে ব্যবহার করা যেতে পারেঃ

- ব্যক্তিগত ও দলীয় অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য
- আপদকালীন সময়ে দলীয় সদস্যদের মধ্যে বিনিয়োগের জন্য
- ঋণ পাওয়ার জন্য সমতুল্য তহবিল হিসাবে ব্যবহারের জন্য

আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জন এবং স্থানীয় মহাজন ও বাহিরের লগ্নি প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যেই সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয় করার প্রবণতা সৃষ্টি করা দরকার। সঞ্চয়ের সঠিক ব্যবহার এবং প্রয়োগও সঞ্চয় সৃষ্টির মূলে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকে। সেজন্য দলীয় ব্যাংক-হিসাব খুলতে হবে ও সদস্যদের সঞ্চয় পাশ বই দিতে হবে।

ঘ. যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ সহযোগিতা

যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং আয়-বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করা একটি অন্যতম কর্মসূচী।

নিম্নলিখিতগুলি এ কর্মসূচীর আওতায় আসতে পারেঃ

- অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাছাই করা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করা
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান
- ঋণ দানের ক্ষেত্রে তুল্য তহবিল হিসাবে সঞ্চয় ও দলীয় তহবিল সৃষ্টি ও পুঞ্জিভরণ
- যান্ত্রিক সহযোগিতা ও সেবা প্রদান করা
- গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা
- অবলোকন ও তত্ত্বাবধান কাজ করা।

ঙ. প্রযুক্তি উন্নয়ন ও স্থানান্তর

এ পর্যায়ে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারেঃ

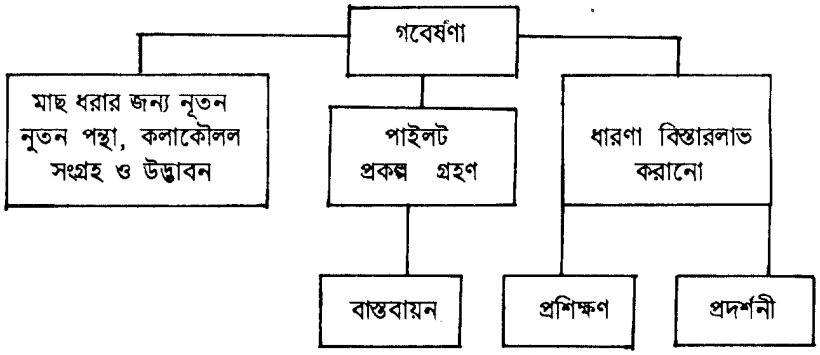

চ. প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রসারণঃ

- প্রয়োজনীয়তা যাচাই
- প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরীকরণ
- বিষয়বস্তু তৈরী করা
- প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ
- ফলো-আপ ও মূল্যায়ন
- ভোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করা

কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে ক্রয় করার নিমিত্তে যন্ত্রচালিত নৌকা বিতরণ কর্মসূচী ঃ

- ৮-১০ জন সমন্বয়ে মালিকানা নেওয়ার জন্য দল গঠন করা
- মালিকানা প্রদানের জন্য চুক্তিপত্র তৈরী করা
- নৌকা বিতরণ করা
- নিবিড় তত্ত্বধায়ন ও অবলোকন
- কাজ করার তহবিলের জন্য ঋণের বন্দোবস্ত করা

ছ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী

- স্বাস্থ্য শিক্ষা
- ইম্যুনাইজেশন
- প্যারামেডিকের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান
- মাতৃ ও শিশুর যত্ন সংক্রান্ত
- পরিবার পরিকল্পনার জন্য প্রেরণামূলক কাজ
- বিশুদ্ধ পানীয় জল ও পয়ঃ প্রণালীর সুব্যবস্থাকরণ

জ. মহিলাদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা

- মহিলাদের মান-মর্যাদার উপর গবেষণা
- মহিলাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্য্যক্রম
- মহিলাদের জন্য শিক্ষা কার্য্যক্রম
- আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানমূলক কার্য্যক্রম

ঝ. বাজারজাতকরণের জন্য সহায়ক কর্মসূচী

- বাজারজাতকরণের জন্য বিকল্প প্রকল্প/সংগঠন স্থাপন করা
- বরফ কল এবং মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কারখানা স্থাপন করা
- যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নেট-ওয়ার্ক তৈরী করা
- মাছ রফতানির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং স্থানীয় বাজারসমূহে দ্রুত মাছ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- জেলেদেরকে মাছ বাজারজাতকরণ বিষয়ের উপর শিক্ষা দেওয়া

৪. উপসংহার

বাংলাদেশের জেলে সম্প্রদায় একটি অবহেলিত ও শোষিত সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য এখন পর্য্যন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মাছের উৎপাদন দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও দ্রুত ক্রমাবনতির দিকে। জেলে সম্প্রদায়ের এ অবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন করা না হলে মাছ উৎপাদন অবশ্যই ব্যাহত হবে।

এ পর্য্যবেক্ষণটি যতই বাধা-বিপত্তি কিংবা সীমিত সময়ের মধ্যে করা হয়ে থাকুক না কেন, যদি নীতি নির্ধারক ও পেশাদারদের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন সাধন করে উপকূলীয় জেলেদের স্বার্থে উন্নয়ন কার্য্যক্রম গ্রহণে অগ্রাধিকার স্থাপন করতে সমর্থ হয় তখনই এ পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হবে।

পর্যবেক্ষণ দলকর্তৃক পরিদর্শনকৃত সংগঠনসমূহ, ব্যক্তিবর্গ এবং কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা

১. মেঘনা ফিস ট্রেডিং সেন্টার (মোট ১৫ জন লোকের সাথে সাক্ষাৎ যারা দালাল, গ্রাম্য মহাজন, আড়তদার, স্থানীয় মক্কেল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ)
২. বেক্সিমকো ফিস প্রসেসিং প্ল্যান্ট (মৎস্য সরবরাহকারী, আড়তদার, প্রকিউরমেন্ট স্টাফ এবং মহাব্যবস্থাপক -৮ জন)
৩. প্রতাপপুর গ্রামীণ ব্যাংক
৪. কুড়িপাইকা বাজার, পটুয়াখালী পুরাতন বাজার এবং মির্জাগঞ্জ বাজার
৫. প্রতাপপুর, নাজিরহাট, কুড়িপাইকা, নন্দীপাড়া এবং মির্জাগঞ্জের স্থানীয় গ্রাম পরিদর্শন এবং প্রায় ১০০ জন জেলে ও সমাজ নেতার সাথে সাক্ষাৎ
৬. জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী
৭. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (DFO), পটুয়াখালী
৮. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পটুয়াখালী সদর ও মির্জাগঞ্জ
৯. স্থানীয় CODEC কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ